চিত্রলেখা

প্রতিমা দেবী

চিত্রলেখা

চিত্রলেখা

প্রতিমা দেবী



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৫০

পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৭৯

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ

বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীবংশীধর সিংহ

বাণী মুদ্রণ। ১২ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার। কলিকাতা ৯

ভূমিকা

কিশোর বয়স থেকে যাঁর কাছে সকল প্রকার শিক্ষা পেয়েছি সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁরি উৎসাহ ও তাঁরি নির্দেশ রচনা করবার ও রসগ্রহণের আগ্রহকে জাগিয়ে তুলেছিল। গুরুদেবের চরণপ্রান্তে বসে যে-ফুল সঞ্চয় করেছিলুম সেই আহরণ দিয়ে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে সাজানো হল শ্রদ্ধার এই নৈবেদ্য। তাঁর গভীর স্নেহের অনুপ্রেরণা আমাকে এই চিত্রলেখা লিখতে উৎসাহ দিয়েছিল।

সাহিত্য রচনা শিক্ষাকালে গুরুদেব আমার কাছে ছন্দের কৌশল ও আঙ্গিকের ব্যাখ্যা করতেন, তার উদাহরণস্বরূপ দুটি কবিতা এই বইতে দেওয়া হয়েছে। একটি 'সাঁওতালী' অন্যটি 'স্মৃতি'। 'সাঁওতালী' গদ্যছন্দে লিখে তাঁকে দেখিয়েছিলুম। গদ্যকে পদ্যে কী ভাবে রূপান্তর করা যায় দেখাবার জন্য তিনি পরিবর্তন করে দেন। 'স্মৃতি' কবিতাটি আমি লিখেছিলুম পদ্যে, তিনি সেটিকে গদ্যে পরিবর্তন করে গদ্যছন্দের কৌশল আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি ছাপিয়ে দেওয়া হল।

'স্বপ্নবিলাসী' লেখাটি গুরুদেবের বিশেষ ভালো লেগেছিল। আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য 'মন্দিরার উক্তি'টি নিজে লিখে পাঠিয়ে দেন আমার কাছে আলমোড়ায়। তিনি তখন মংপুতে ছিলেন। তাঁর আদেশ এল আমি যেন 'নরেশের উক্তি' লিখে পাঠাই জবাবে। কিন্তু তাঁর রচিত 'মন্দিরার উক্তি' পড়ে

তার পর নিজে কিছু লেখবার মতো দুঃসাহস, বলা বাহুল্য, আমার হয় নি। তাঁর এই লেখাটিও এই বইয়ের মধ্যে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। এগুলি আমার সাহিত্যচর্চার পথে তাঁর স্নেহাশিস।

গুরুদেবের এই লেখাটি পরিবর্তিত আকারে তিনি পরে প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর জীবিতকালে লিখিত আমার অনেকগুলি রচনাই তিনি সংশোধন বা অনুমোদন করে দিয়েছিলেন।

এই বইখানির অধিকাংশ লেখাই পূর্বে প্রবাসী ও কবিতা পত্রিকায় 'কল্পিতা দেবী' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে। এই নামও গুরুদেবেরই দেওয়া।

সূচী

স্বপ্নবিলাসী

রেনকের পাহাড়ের গায়ে ঝুলে আছে ছোট্ট একটি আরামকুঞ্জ, বাবুইয়ের বাসায় অর্কিড-রঙিন স্নিগ্ধ ছায়া, মেঘের নীল ডানার তলায় ঘুমন্ত নীড়। ছিটকে-আসা পড়ন্ত রোদ সাদা পাল তুলে দেয় পাহাড়ের গায়ে— হালকা তার গতি বিরহীর স্বপ্নে মিলনে সারিগানের মতো। মন্দিরার 'আরাধনা'য় পৌঁছল কবি নরেশের খ্যাতি। কবির প্রথম আসায় শহর সজাগ হয়ে উঠেছে— মজলিশের বিচিত্র আয়োজন। মন্দিরা পারল না থাকতে. থমথমে মন নিয়ে শহরে পৌঁছল, দুরদুর করছে বুক। আজ অনেকদিন পরে অযাচিত দেখা শহরের ভিড়ের মধ্যে।

মহিলা দেহরক্ষিণীরা নরেশদাকে ঘিরে ব্যূহ বানিয়েছে। সদালাপের রসে নরেশের আত্মচেতনা ঝকঝক ক'রে উঠছে গৌরবে। প্রশংসার নেশায় বিভোর সে, এমন সময় জোড়া জোড়া চোখের তীব্র কটাক্ষ এড়িয়ে মন্দিরা দাঁড়াল গিয়ে বেদীর কাছে। অবিশ্রাম মেয়েলি ন্যাকামিতে দম-আটকে-আসা হাওয়া— সাধনার মুখোশের তলায় হ্যাংলামির প্রচ্ছন্ন রূপ। নরেশদার সিল্কের চাদর খসে পড়ছে অনবধানতায় কাঁধ থেকে, রঙিন পাগড়ির তলায় প্রহেলিকা-আঁকা মুখ, বসন্তের বৈরাগী কবি।

চিনে নিল পুরানো বন্ধুকে, ঝাপসা অতীতের ছায়া পুরবীর শেষ তানের মতো মনে যে এখনো লাগা। হাততালি ক্ষীণ

হয়ে এল কবিতা-আবৃত্তির শেষে। মন্দিরা নিচু গলায় মিনতি করে বললে, "নরেশদা, এমন করে চলবে না, আমার বাড়ি চলুন, এমন করে কি স্বাস্থ্য ভালো হবে।" বাধাশূন্য নরেশের মন বসন্তের প্রজাপতি— ফুলের গন্ধ তাকে টানে, পথের খবর সে রাখে না। এ অযাচিত নিমন্ত্রণ গ্রহণে বাধা হবে কেন।

সভার শেষে মেয়েরা নরেশদাকে ঘিরে ধরে। অটোগ্রাফের হরির লুট ছড়িয়ে কাউকে মিষ্টি হাসি কাউকে বা চোখের চাউনির অনুগ্রহ বিলিয়ে স্বপ্নবিলাসী উঠে পড়েন মন্দিরার রথে। জনতার চাপা গলায় ঠাট্টা ভিড়ের গুঞ্জনে শোনা যায়— দ্বাপরে সুভদ্রাহরণ কি কলিতে কবিহরণের পালায় রূপ নিল। ভক্ত মেয়েরা মুগ্ধচোখে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বাক নিশ্চল।

'আরাধনা'র কুঞ্জ আতিথ্যের বদান্যতায় পূর্ণ— রূপে রঙে সৌরভে কোথাও সংকোচ নেই তার। সমস্ত পাপড়ি খুলে ধরেছে কোন্ পূর্ণিমার অপেক্ষায়। নরেশের অসম্পূর্ণ ইচ্ছার ইঙ্গিত নিপুণ হাতের সেবায় ভরে উঠেছে ডালা, ত্রুটি থাকে নি কোথাও। কবি ভান করেন তাঁর নির্লিপ্ত মন সজাগ নয় রমণীর প্ররোচনায়। কিন্তু একটা অজানা দাবি তার সুদৃঢ় থাবার মতো নিকটের লোকের উপর চাপ দিতে থাকে কেবলই। বসন্ত-পঞ্চমীতে শহরবাসীরা সংবর্ধনার আয়োজন করে— সভায় লোক ঠাসাঠাসি। মেয়েরা সামনে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলে, বাধা মানে না। ঘন ঘন সাধুবাদে নরেশদা গদগদ— কে এসে মাল্যচন্দন পরায়। মুখ তুলে অবাক! "রেখা তুমি এখানে?" "হ্যাঁ, দুদিনের জন্য এসেছি।" সভায় লোক জমাট বেঁধে নরেশদাকে ঘিরে ধরে, স্তবস্তুতিতে বদ্ধ গৃহের হাওয়ায় ঘূর্ণাপাক

লাগে। মন্দিরা নরেশের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। চকিতে রেখা এসে থমকে দাঁড়ায় গাড়ির দরজা ধরে— চোখের চাউনি স্থির, দৃষ্টিতে মিশানো আছে হিপ্‌নটিক কিছু— "কাল চললুম শিলঙ, পারেন তো আসবেন।" হর্ন বাজিয়ে অন্ধকার বাতাসে গাড়ি মিলিয়ে যায়। সেনাপতির কড়া হুকুমের মতো কথা-গুলো মনের মধ্যে কেবলই তোলপাড় করে।

'আরাধনা'য় সন্ধেপ্রদীপ জ্বলছে, উচ্ছ্বাসের হিল্লোলে আজ অবসাদ কিছু। মন্দিরার হাসিঠাট্টা বজায় রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা কেবলই খাদে নেমে নেমে পড়ছে। ব্রাউনিঙ কীট্‌স সাঁঝের আবছায়া লুকোচুরিতে জমে উঠছে না তো। দুজনার হোঁচট-খাওয়া মন আজ থমকে দাঁড়িয়ে, কাচের শাসির ভিতর দিয়ে তাকায়, ভাঙা মেঘের কানা থেকে উপচে-পড়া রুপোলি আলোর দিকে, বাতি নিববার আগেই অন্যমনে বিদায়ের পালা।

ভোরের আলো ঘোমটা খোলে নি, সে উঠেছে অনেকক্ষণ। উপেক্ষিত রজনীর কালো ছায়া চক্ষুপল্লবের কোণে আঁকা। এক-আঁচল বকুল কুড়িয়ে মন্দিরা চলেছে নরেশের ঘরের দিকে, দরজা খোলা, শূন্য ঘর। চাঁপারঙের উড়ুনি বিছানার উপর প'ড়ে, সেইসঙ্গে একটুকরো পেনসিলের লেখা— শিলঙের পথেই গেলুম। মাথা নুয়ে পড়ে উড়ুনির উপর।— একি শুধু গতির বেগে আঁকাবাঁকা খেলা, কালের খেয়ালে; এই পথের দেখা মনের উপর কিছু ছাপ দেবে? অবসরের মাঝখানে কখনো কি হঠাৎ পড়বে মনে একটি ভেসে-যাওয়া-দিন?

মন্দিরার উক্তি

নমস্কার তোমাকে কবি। তোমাকে চিনতুম না, চিনতে চেয়েছিলুম, চেনা হয়ে গেছে, আর বেশি সইত না ঠিক জায়গায় দাঁড়ি পড়েছে। বাঙালির মেয়ে অত্যন্ত করে জানি কেবল ঘরের লোকদের। লোভ ছিল অজানা জগতের পরিচয়ে। আমার বয়স ছিল কাঁচা, কলেজের মধ্যপথ থেকে সদ্য বেরিয়েছি, তখন আমার প্রাণীবৃত্তান্তে সব চেয়ে অজানা প্রাণী ছিল কবি।

তখন চোখে দেখি নি নরেশবাবু তোমাকে, তোমার একটা আভাস ছিল মনের আকাশ ছেয়ে। তোমার লেখা পড়ে ভেবেছি তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ তোমার মানসীকে, ভোরের আলোয় তাঁর সিঁথের সিঁদুর, সন্ধের তারায় তার কপালের টিপ।

রূপকথার রাজপুত্র তুমি, জগতে একটিমাত্র আছে রাজকন্যা সমুদ্রপারে— সে আছে তোমারই জন্যে। তখন এমন কথা যদি মনে করে থাকি— সে মানসী আমিই, তবে হেসো না। ঐ বয়সে অনেক মেয়েই মনে করেছে ঐ একই কথা। কেউ বা তোমাকে চিঠি লিখেছিল, সে চিঠি ফেলেছিল ছিঁড়ে। স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন। তবু তার আড়ালে কতদিন আবছা হয়ে গেছে একলা দুপুরবেলায় পরীক্ষার পড়া; বুকের মধ্যে হঠাৎ উছলে উঠেছে একটা খাপছাড়া যৌবনের ঢেউ।

একেই বলে রোম্যান্স, নবীন বয়সে আপনা-ভোলানোর শিল্পকলা। মনের দেহলিতে এঁকেছি আলপনা কে আসবে

তারি পা ফেলবার পথে। আরো কিছুদিন যেত, বয়স বাড়ত, ঘোর ভেঙে যেত চোখের থেকে— বঁধুর আসবার পথে আসত যে সে দিত আলপনার উপর গোবর নিকিয়ে, তার নাম ঘরকন্না। এমন অনেক মেয়েকে দেখলুম তারা একদিন আমারি সঙ্গে আই. এ. দিয়েছে, কীট্‌সের কবিতা যখন পড়েছে, অজানা নাইটেঙ্গেলের অশোনা সুরে ব্যথিয়েছে তাদের পাঁজর, তাদের হৃদয়ে বাতায়নের দ্বার খুলে গিয়েছে ফেনিল সমুদ্রের জনশূন্যতায় উজাড় পরীস্থানে। নরেশবাবু, সেই ছিল তোমার শুভলগ্ন— দিনেরাতে দুলেছ ছন্দের ভঙ্গে, কত তরুণীর কম্পমান চিত্তের রহস্যদোলায়।

দেখতে দেখতে সেই মেয়েদের সময় বয়ে গেল, এল ঘরকন্না— সেই দেউড়ির ধারের রাস্তাটার চিহ্ন রইল না। আমার ভাগ্য ছিল ভালো। রোম্যান্সের আষাঢ়ে দিন ফুরোয় নি যখন, এমন সময় আলাপ হল শুরু।

চেনার প্রথম অধ্যায়েই ধরা পড়ল তুমি একেবারেই দুর্লভ নও। হে কবি, মায়াজাল তো দেখি আমাদেরই দিকে। গদগদ মন তো ধরা দিতেই আছে, এত সহজে যে তাকে ভালো মৃগয়া বলে না।

উল্টে গেল খেলা। তোমাকে ধরা দেব বলে পথ চেয়ে বসেছিলুম— এখনকার লীলা হল তোমাকে ধরব ব'লে। দুঃখ এই, তুমি দুর্লভ নও।

এদিকে রোম্যান্সের দিন ফুরিয়ে এল। ঘরকন্নার সাড়া পাচ্ছি। তাই সেদিন শেষ খেলা খেলতে বসেছিলুম। 'আরাধনা'য় আমার শৈলকুঞ্জে ফাঁদ পেতেছিলুম রসে রঙে রাগে

রাগিণীতে। মনে মনে হেসেছিলুম তোমার গদগদ চিত্তের বিহ্বলতায়।

এমন সময় এল আর এক মায়াবিনী— রেখা। ফাঁস ছিল তারো হাতে। আমরা এক ব্যবসায়ের ব্যবসায়িনী। দেখলুম অল্প একটু টান দিতেই প্রাণীটি পড়ল কাৎ হয়ে। তুমি বোধ হয় জানো না সব মেয়ের মধ্যে ভিতরে ভিতরে বাজি রাখা আছে। রেখা এল আমার দরজায়। সে চাইলে আমার মুখে, আমি চাইলুম তার মুখে। জিতল সে বাজিতে। কিন্তু খুব কি মূল্যবান বাজি।

খুব হাসতে চেষ্টা করছি। রেখাকেও আমারি মতো হাসি হাসতে হবে, বেশি দেরি নেই।

আমার জীবনের এই রোম্যান্সটুকু খুব স্বল্পকালের, তাই এখনো তাতে কিছু রস বাকি আছে, আছে কিছু ব্যথা। আর বেশি দেরি হলে হাসির লেশও থাকত না, চোখের জলও যেত শুকিয়ে।

নটী

শহরের সন্ধ্যা। ধুলো ধোঁওয়ায় নোংরা আকাশ, সূর্যাস্তের লালচে আভায় মরচে-পড়া। বট্‌ল্-পামের পাতার হাতছানি, ধূসর পর্দার পিছন থেকে ছমছমে ছায়ার ভুতুড়ে ইশারা। হঠাৎ আকাশ-ফাটা আওয়াজ উঠল, দৈত্যের হুংকার যেন, জলস্থলের বুক উঠল ধড়াস করে। প্রকাণ্ড তুই ডানা ছড়িয়ে নেমে আসে উভচর যন্ত্রগরুড়, নিরীহ ডিঙিগুলো কে কোথায় সরে পড়ে। ঠেলা খেয়ে ফুলে ওঠে নদীর জল, শিউরে ওঠে শহর।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে জীর্ণ দোতলার ঘরের জানলা খোলা, জ্বলছে লণ্ঠন, আয়না-হাতে রিনি এঁকে চলেছে নিজের মুখ, আজ তার রিহর্সলের দিন। দেখতে দেখতে চেহারা তৈরি হয়ে উঠছে, বিধাতার হাতের কাজে চালাচ্ছে কারিকুরি, মনের কামনা কল্পনার পোঁচ লাগিয়ে চলেছে। চোখের পাতার তলায় কালো কাজলের টান। আনত চোখের বাঁকা চাউনির কোণে থমকে রইল আবেগের চাতুরী। ঠোঁটের ভাঙনের ধারে অস্পষ্ট রঙের বিন্যাসে মুচকে হাসির জাতু।

ঘরের চেহারা অত্যন্ত এলোমেলো, অযত্নের হেলাফেলা চারি দিকে। পাশের ঘরে অসুস্থ স্বামী শুয়ে, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে, দারিদ্র্যকে উপহাস করে হারিকেন লণ্ঠনের আলো আভা দিয়েছে তার মুখের উপরে।

হর্ন বাজিয়ে মোটর এসে খিড়কিতে থামে। সওয়ার বেরিয়ে আসে হালফেশানের শৌখিন বাবু, রিস্টওয়াচ হাতে। নতুন-খোলা থিয়েটারের ম্যানেজার, ভদ্রঘরের মেয়ে-মৃগয়ায় পটু। খোলা জানলায় পড়ল তার নজর, শিসের সিগন্যাল পৌঁছল উর্ধ্বে। সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে এল, দাঁড়াল তরুণীর পিছনে, বড়ো আয়নার উপরে ফুটে ওঠে দুজনের ছবি, আর গলির ছাদে বন্দী আকাশের তারাখচিত খণ্ডনীলাম্বরীর এক আঁজলা।

রিনি হেসে বেঁকে পড়ে, সিগারেট থেকে ধরিয়ে তোলে মুখের সিগারেট। তেল শুকিয়ে দীপ ঝিমিয়ে পড়েছে, কেবল শিখার দুটি ফোঁটা অন্ধকারে আয়নার উপর রোমান্সের ইঙ্গিত করে। দেয়ালের পিছন থেকে অসম্ভব কাশির ফিট দুজনকে চমকিয়ে তোলে। মেয়েটি দৌড়ে চলে যায় পাশের ঘরে, একখানা দশটাকার নোট রোগীর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, "ঝিকে দিয়ে দুধ আনিয়ে নিয়ো। আমাকে এখনি যেতে হবে রিহর্সলে।"

পরক্ষণে দমকা হাসির আওয়াজে সিঁড়ির শূন্যকে আলোড়িত করে দিয়ে দ্রুত নেমে যাবার শব্দ শোনা যায়। দেয়াল ভেদ করে পিছনে ডাক দেয় রোগের কাতরানি। অন্ধকারের ব্যর্থ অনুনয় ভাঙা চৌকাঠের উপর মাথা ঠুকে পড়ে। রোগীর হিম হাতের মুঠো ঢিলে হয়ে আসে, অজানিতে নোটখানা মাটিতে পড়ে গড়ায়, মেয়ে কেঁদে উঠে ডাকে 'বাবা', জবাব পায় না।

হলিউডের নকলে থিয়েটরের আসর জমেছে নবরাসরঙ্গের পালা। জুটেছে কুমারী কণিকা, কিশোরী রেণুকা, তরুণী

অণিমা ; নানারকম চেহারা, রঙিন আলোর ভোজবাজি ; চাদরের আবরণের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখের পালিশ ঝকঝক করে আলোর ঢেউয়ে। বিবিধ মনের নাট্যলীলায় হরেকরকম বহুরূপীর চেহারা নতুন নতুন ছাঁদে তৈরি। মুখগুলো তরুণ কোমল বিহ্বল ব্যঞ্জনার বানানো মুখোশ। ঘরের হাওয়া গাঁজিয়ে উঠেছে রঙ্গভঙ্গের কচলানিতে। মুক্তির ভরসায় যে বেরিয়ে পড়েছিল, বেড়া ভাঙল, গহ্বরের মধ্যে সে পড়ল আটকা।

অসংলগ্ন ঢিলে মন রিনির, আত্মবিজ্ঞাপনী নেশায় মত্ত, কালের কলের পুতুলের ছাঁচ সে, হালফেশানের আঙুলের চাপের ছাপে তৈরি ; কোন্ যন্ত্রে চালাচ্ছে তাকে।

রাত অনেক হয়েছে। দূরে দূরে মিটমিট করছে রাস্তার বাতি। প্রাণের শেষ উত্তেজনার মতো কোনো আধেক-বন্ধ জানলার প্রদীপ দপদপ করতে করতে নিবে এল। থার্ডক্লাস গাড়ির খড়খড়ে আওয়াজে আকাশের বিরক্তি ধরে, নগরের বুক আঁচড়ানো তার চলা।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণের নিশাচরগুলো তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে অলিতে গলিতে। রাতজাগা চোখ তাদের লাল, চোখের কোটরে দাগ কেটেছে জীবনের লুকানো ইতিহাস, গালে টোল খেয়েছে, বিষবাষ্পের ভুসো কালি মলিন করে দিয়েছে তাদের মুখ। বাড়ির কাছে গাড়ি এসে থামে। লক্ষপতি স্টেজ-ম্যানেজার গেছে তার প্রাসাদে ফিরে। ‘বলো হরি, হরি বোল’ রব আসে গলির মোড় থেকে। জানি নে কোন্ ঘাটের পাশে কার চিতার আগুন তখন নিবু-নিবু। পোষা কুকুরটি ছটফট করে বেরিয়ে

আসে, আঁচল ধরে টানে, মরণের গন্ধ পেয়েছে সে ঘরের আকাশে। মাথার উপরে রাতের পাখি ডাক দিয়ে চলে যায় ; নির্মম বিধাতার টিটকারির মতো।

উড়োজাহাজ চলেছে শুকতারার শান্ত চোখের সামনে দিয়ে, সমুদ্রের পার থেকে সমুদ্রের পারে। ভোরের ফ্যাকাশে চাদরের তলায় ঢাকা পড়ল নাট্যভূমির যবনিকা, কালরথের নকিব মোরগ আস্তাবলের আবর্জনার উপর থেকে জানিয়ে দিল জীবনযাত্রার নূতন পরিস্থিতি।

সতেরোই ফাল্গুন

সকালবেলায় একটা কোকিলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল, সে ভাবল, আজকের দিনটা বুঝি ভালোই যাবে।

স্নান করে পরল কুসুমফুলের রঙে রাঙা শাড়ি, লালপাড়ের আঁচল ঝুলছে কাঁধের উপর চাবিবাঁধা— বড়ো একটা সিঁদুরের টিপ কপালে, খোলা চুল, মুখের চারি দিক ঘিরে নেমে পড়েছে থাকে থাকে, হাঁটুর কাছ পর্যন্ত, কালো রঙের ঢেউ। দূরে সিন্দুকের উপর ভাঁজ-করা চেলি, মনে করিয়ে দিল তার বিয়ের দিন, সেদিন আজ এসেছে, এই সতেরোই ফাল্গুন।

আপিস-পালানো পায়ের আওয়াজ সিঁড়ি দিয়ে উপরে এল, আবার সিঁড়ি দিয়ে হুড়হুড় করে গেল নেমে, ব্যাগ ভরে নিয়ে গেল নোট দিয়ে। আজকের দিনের কোনো মানে নেই ওর মনে। কেবল মনে আছে মোহনবাগানের খেলা। দীর্ঘনিশ্বাস গুমরে উঠল মেয়েটির বুকে, দাঁড়াল এসে জানালার ধারে।

রাস্তায় খুব ভিড়, ট্রামে লোক ঠেসাঠেসি, রেলিং ধরে ঝুলছে কত মানুষ বারণ মানছে না। নানা ট্যাক্সির নানা আওয়াজ নকশা কেটে চলেছে শহরের বাতাসে। দেয়ালে টিকটিক করছে বড়ো ঘড়িটা; লোকালয়ের বুকের স্পন্দন গুনছে, বৃহৎ শহরের বৃহৎ ভিড়, হঠাৎ বেজে উঠল তিনটে। মারলে বিরহিণীর বুকে কালের কঠোর আঘাত।

অভ্যেসবশে বিকেলে আসন পাতে, সেবার আয়োজন করে জলখাবার— রেকাবির উপর যত্নে গোলাপের পাপড়ি-

ঢাকা মেঠাই, নানা রঙের ফল, হাতের কায়দা দিয়ে সাজানো, তারই মাঝে রুপোর গেলাসে সুগন্ধ-ঢালা লুড়কি, এককোণে তবক-দেওয়া মিঠে পান। এনে রাখল আসনের সামনে, থালার কিনারা ঘিরে মেঝের উপর সাদা আলপনা, তার আঙুলের তুলি সাজিয়ে দিয়েছে সাধের লতাপাতার রূপ।

সন্ধে হয়ে এল, পাশের বাড়িতে কনে-স্নানের উলু পড়ে। সেখানে আজ কারো বিয়ে। তখন খড়খড়ি খুলে দাঁড়িয়ে থাকে পথের দিকে— কৃষ্ণচূড়ার গাছে লাল ফুলের আগুন জ্বেলেছে। আজ বুঝি দেবিকারানীর অচ্ছ্যুৎকন্যার সিনেমা? বিজ্ঞাপনীওয়ালার গোরুর গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে গেল। মালী নিয়ে আসে জুঁইয়ের গোড়ে, চাঁপার তোড়া, চেলিখানা ছড়ানো আছে খাটের উপর, ঘরের ভিতর সন্ধের ঘোলাটে আলো, প্রদীপ তখনো জ্বলে নি। বাইরে থেকে কচি গলা চেঁচিয়ে বললে, “বউদি, দাদা গেলেন সিনেমায়, ফিরতে রাত হবে।” ঝনাত করে চাবির গোছা পড়ে গেল মেঝের উপর, শুকিয়ে উঠল তালু। এখনো বাজছে বিয়ের সানাই পাশের বাড়িতে, আকাশজোড়া একটা অবিশ্রাম ঠাট্টা, হাঁপিয়ে উঠে সে বসে পড়ল মেঝেতে। ইচ্ছে করল মাথা ঠোকে একটা কিসের উপরে। গোড়ে মালাটা নিয়ে ছিঁড়তে লাগল একে একে ফুলের পাপড়িগুলি।

মেজোবউ

গলির ওপারে বনেদি বংশের দালানবাড়ি। সেখানে লক্ষ্মীর বিদায় নেবার পথে ছাপ পড়েছে সর্বত্র। দাগ-ধরা, স্যাঁতা-পড়া, চুনসুরকি-খসা দেয়াল পাঁচিল নগ্ন দারিদ্র্যের লজ্জা খুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রোদের চুমুক পান ক'রে দুই পহর বেলায় চারি দিক যখন ঝিমিয়ে পড়ে, দেখা যায় ফাটা খিলেনের ফাঁক দিয়ে পোড়োবাড়ির হালছাড়া দশা।

আমার বাসা সামনের বাড়িতে কোণের ঘরে, পটের উপর তুলি কালি বুলোবার কারবার ফেঁদেছি, যা-খুশি তাই করে দিন কাটাবার অধিকার পেয়েছি কিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তির প্রশ্রয়ে। মাধুকরী বৃত্তিই আমার সৃষ্টি-কল্পনার ব্যবসায়। সংসারের পথেঘাটে মনটা এদিক-ওদিক থেকে টুকরো-টাকরা যা পায় ঝুলি ভরে তাই দিয়ে।

বেছে বেছে এই ঘরটা ভাড়া নিয়েছি। অনেকদিনের বেকার কালো দেয়ালগুলোয় মডার্ন আর্টিস্টের ছাঁদে ছবি দিয়েছি লেপে, তাতে আভাস পাওয়া যায় নানারকম, মানে পাওয়া যায় না। একটা নড়নড়ে তক্তাপোশে আমার কাজও চলে বিশ্রামও হয়।

যেখানে চারি দিকটা সুশৃঙ্খল সুপরিচ্ছন্ন সেখানে পারি-পাট্যের সুসম্পূর্ণতায় আদুরে হয়ে পড়ে মন, অকাজে দেয় গা ঢেলে।

তাই গলির এই অনাদৃত ঘর, আর একখানি পূর্বইতিহাস-বিস্মৃত তক্তাপোশ উড়ো ভাবনাগুলোকে রাস্তা ছেড়ে দেয়। আবার ওদিকে চলেছে চিকের আড়ালে ঝাপসা মূর্তির চলাচল, তুলিটা তার মোহে পড়ে তার অনুসরণ করতে চায়, বাঁধা পথের বাইরে কুড়িয়ে-পাওয়া ছায়ামণির লোভে।

দিন চলেছে চোখের সামনে। চলতে ফিরতে রূপের আঁচড় লাগিয়ে যায় মনটাতে। ছবি যখন আঁকি জানি নে সে কী যে। রেখার যোগবিয়োগ ঘটতে থাকে একটা কোন্ বেআইনী চালে। অনর্থক কৌতূহলে চেয়ে দেখি হিজল গাছের আড়ে একটুখানি ছাতলা-পড়া ঘাটের সিঁড়ি পানা-পুকুরের পাড়ে। কেউ জল তুলতে আসে, কেউ নাইতে, কেউ মাছ ধরতে। ছেলেরা কানামাছি খেলে, সুকুমার দেহে প্রাণের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তোলে গতির আবর্ত। তরুণীর দল কাঁখে কলসী। ভারমন্থর চরণচিহ্ন রেখে চলে সিঁড়ি-পৈঁঠায়, কলসীর জল উছলে পড়ে, পায়ের ছাঁদ মুছে যায়। দূরে সাদা মেঘের লাইনগুলো দিগন্তে বনের লাইন খুঁজে চলে।

অপূর্ব ধরণী, ছড়িয়ে দিয়েছে রেখার ঝাঁক। আমার তুলি তার থেকে তুলে নেয় এক-একটা রেখার রূপ, যেন অতল থেকে মাছধরার মতো ছিপ দিয়ে।

লাল ডুরেশাড়িতে চাবিবাঁধা আঁচল কাঁধের উপর ঝোলে, ফুটে ওঠে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে দেহভঙ্গির নিবিড় সংগতির ছন্দ। ঝিলের আলো ঝলমলিয়ে ওঠে, মা এসে বসেন শিশু-কোলে ঘাটের ধাপে। আঁতকে ওঠে শিশু হঠাৎ কোনো কালো ছায়ার চমকে, মা তাকে বুকে আঁকড়ে ধরে চাপা

আঙুলের সম্মোহনী তার দেহে বুলিয়ে চলেন। অপরাহ্নের আভা শিশুর মুখে, কাজলটানা চোখে তৃপ্তির ভারে নত। আমার তুলিতে জাগে রোমাঞ্চ। ম্যাডোনার স্বপ্নরূপ দেখতে পাই প্রদোষের ছায়ার ঘের দেওয়া। কিন্তু সকলের চেয়ে মায়া বিস্তার করে ঐ চিকে আবছা-করা মানুষ; অস্পষ্টতার বঞ্চনা ভরিয়ে তোলে ছবির চোখ আপন জাদু দিয়ে।

সকালে সদ্য স্নান করে কে দাঁড়ায় ঐ চিকের অন্তরালে। মনে হয় যেন ঘন কেশের গন্ধ উড়ে আসে লটকান-রঙা কাপড়ের সুবাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে।

বেলা বেড়ে চলে। আমার কাঁচ-ভাঙা জানলায় রোদের আলো বাঁকা হয়ে পড়ে, দুপুরের তামার রঙের আকাশে চিল-গুলো যায় উড়ে। তুলিটাকে থামিয়ে দিয়ে বসে বসে ভাবি।

বোধ হল আঁচল বিছিয়ে শুয়েছে কে। ক্লান্ত দেহ শিথিল দিবসের কাজের শেষে। এমন সময় দূর থেকে ডাক শুনতে পাই— মেজোবউ। উত্তরে শুনি— যাই। সুরটা যেন পাতলা মেঘের ভিতর থেকে চাঁদের আলো। তুলিতে রূপ নিতে থাকে মেজোবউ। বাউল কোন্ অদৃশ্যকে বলে মনের মানুষ— আমার হৃদয়ে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে মনের মেজোবউ অদৃশ্যলোক থেকে।

আকাশ উপছে উঠেছে আবীরের আভায়। দোলন-চাঁপার গন্ধে মিশে গেছে অবসরের দীর্ঘ বেলা। রাতের কালো আঁচল জড়িয়ে ফেলছে দিনকে।

পরের দিন। রাতের হয়েছে শেষ। ছাতের উপর আলো তখনো স্পষ্ট হয় নি, দীপ-হাতে ছায়াময়ী চলেছে ঢাকা বারান্দার

পথে। ক্ষীণ শিখায় দেখা যায় কাঁকন-ঘেরা পেলব দুটি হাত, চলেছে কোন্ দেবতার উদ্দেশে বাতি জ্বালিয়ে। দেহ-ঘেরা পাতলা শাড়ি দক্ষিনে হাওয়ার মতোই ফুরফুরে।

রেখার ধ্যানে ধরেছি তোমাকে চিত্রিতা, আমার রঙের দুর্গে বন্দী তুমি আজ। যে-সাধনার গভীর অতলে তোমার রূপের মাধুরী ছায়ার পিছন থেকে দিনে দিনে আপন আহ্বান পাঠিয়েছিল, সাড়া দিয়েছি তাকে, আমার সৃষ্টিতে সে হয়েছে মূর্তিমতী। একদিন তুমিও থাকবে না আমিও থাকব না কিন্তু আমার আত্মাকে বাহন করে তোমার আবির্ভাব চলবে মৃত্যুর পরপারে।

সকালের আলোয় ঘুমভাঙা শহরটা চোখ রগড়াচ্ছে। তার চেহারাটা গত রাতের মদ-খাওয়া দেহের মতো ঢিলে। কাকের ডাকে পাক খেয়ে উঠছে বাতাস। অন্দরমহলে ছায়ালোক ম্লান।

বুড়ি ঝি এল আমার বারান্দায়। বললে, বাবাঠাকুর যেতে হবে ওবাড়িতে, অক্ষয়তৃতীয়া ব্রতের পারণ। আমাদের মেজোবউমা ব্রাহ্মণভোজন করাবেন।— চমকে উঠলুম। যে মেজোবউয়ের নিমন্ত্রণ আকাশে আজ তা এল প্রত্যক্ষে।

গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করলে। মাথা তুলতে দেখলুম, সত্য নয়, এই প্রৌঢ়া! চিরকালের ভুল! কিন্তু কাকে বলি সত্য ?

আমার ধ্যানসমুদ্রের উর্বশী, স্বয়ম্ভূ তুমি। উদয়াচলের দিকে চেয়ে থাকবে পথিক তোমার শেষ চুম্বনরশ্মির প্রতীক্ষায়।

সিনতলা দুর্গ

সিনতলার পাহাড়ি দুর্গে কয়েদী নীতেনের বাস, অপরাধ তার ভালোবেসেছিল দেশকে, বিপ্লবী তাই বন্দী হল সরকারের জেলে, আর সমাজও তাকে ত্যাগের হুকুম দিল হেঁকে, জাতের চেয়ে সে মানুষকে বড়ো করে দেখত বলে! শিশুকালে মায়ের নামকরণ ছিল উড়নচণ্ডী ছেলে। সে কলেজ ছেড়ে যখন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরত তখন থেকেই তিনি তার আশা ছেড়েছিলেন। এক শ্যামবর্ণ মেয়ে, আশ্বিনের চিকন ধানের সোনালি আভা তার গায়ে, ধানের শিষের মতোই সে ছিপ্‌ছিপে, ভেসে এল জীবনস্রোতের প্রথম জোয়ারে নীতেনের পক্ষে সয়ে নিতে তার সকল পাগলামির অকারণ অত্যাচার।

একদা প্রতিবেশিনীর এক সখীর কাছে মা চোখের জল ফেলে বলে, হায় রে কপাল! তবু যদি বকুলা না হত তেলীর মেয়ে। সেদিনের একরত্তি মেয়ে গাঁয়ের পাঠশালায় ছেলের সঙ্গে পড়ত। ছোটোলোকের মেয়ের আবার পড়াশুনো! লজ্জাহীনা অফুরন্ত তেজে সদাই টগবগে। ওর বাপ ছিল সৎ, পূজাপার্বণে প্রণামী দিয়ে পায়ের ধুলো নিত, কত না বিনয়, কত কুণ্ঠা তার, হাজার হোক আমরা জাতবামুন, থাক্-না ভাই ওদের পয়সা।

মার আঁচলের গিঁটকাটা ছেলে একদিন উড়ল, মা আঙুল মটকে সেদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জানি জানি, মায়াবিনী বকুলাই সর্বনাশের মূলে, ওরি সঙ্গদোষে তো নীতেন আমার একঘরে।

নীতেনের নিরুদ্দেশের কিছু পরেই বকুলাকে সে-পাড়ায় আর দেখা যায় না, পাড়ার লোকেরা মুচকে হেসে চোখ মটকায়, ক্রমে তাদের মন থেকে কখন যে সে ভেসে গেল কেউ লক্ষ্যও করল না।

এ ঘটনার পর দু-বৎসর গত, একদিন নীতেনকে হঠাৎ দেখা গেল লক্ষ্মৌর আদালতের কাঠগড়ায়। চেনার জো নেই, দাড়ি গজিয়েছে, লম্বা চুল, গৈরিক পরনে, রাজদ্রোহী সে, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত। দণ্ড হল বিশ বৎসর কারাবাস।

সেই থেকেই সিনতলার এই পাথরঘেরা দেয়ালের কোণে পাঁচ বৎসর গেছে কেটে। কঠিন বিদ্রোহীর প্রাণে শিকলের দাগ তখনো বসে নি। ছোটোখাটো অপরাধ প্রায়ই ঘটত, গর্বিতচিত্ত তার আত্ম-অবমাননার গর্ত থেকে ব্যর্থ ফণা তোলবার চেষ্টায় হুমড়ি খেয়ে পড়ত। যেতে হত তাকে বেত খাবার ঘরে, সেখানে শাসক ভালো করে জানিয়ে দিত উদ্ধত বেতের দৌড়।

তবু নীতেনের মন নির্বিকার, স্তব্ধ কপালের শিরাগুলি উঠত কেবল ফুলে, পাহারাওয়ালার গুঁতো খেয়ে দরজার ভিতর দিয়ে ছিটকে এসে পড়ত মেঝেতে অর্ধমূর্ছিত দেহে। কুলুঙ্গির প্রদীপের শিখায় কাঁপন লাগত, করুণ ছায়া পড়ত ফ্যাকাশে তার মুখের উপর। ধিক্কারে উঠত সে গুমরে, কী নির্মম মানুষ, নিষ্ঠুরতার গিলোটিন বানিয়েছে মনুষ্যত্বকে বলিদান করে। এই হ্যাঙলা কুকুরের উচ্ছিষ্ট হয়ে লজ্জিত পৃথিবী আর কতদিন পড়ে থাকবে। ক্লান্ত দেহের রক্ত হিম হয়ে আসে রাগে, তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠে বুকের ছাতি।

জানলার গরাদে দিয়ে বন্দী দেখে চেয়ে, এল এক মেয়ের হাত জল নিয়ে। সেই থেকেই প্রহরে প্রহরে দেখা যায় দুখানি বাহু রেখে যায় আহার জানলা গলিয়ে। প্রদীপের আভায় কালো চুড়ি ঝিকমিকিয়ে ওঠে, অবাক হয়ে সে চেয়ে দেখে দুখানা হাত। উদাসী ভাবে নিয়মের এ ব্যতিক্রম কেন, কোথায় সে পুরোনো প্রহরী। কখনো বা চোখে পড়ে দুটি কালো চোখের তারা বাতায়নের শূন্য ভরে কৌতূহলের আতসবাজি, যেন অতীত-কালের বোবা স্মৃতি মূর্তি নেয় অন্ধকারের আবেষ্টনে, অলক্ষ্যে অচিন বাহুর ডাক মনের পেয়ালা দেয় ভরে।

এমনি করে দিন যায়— একদিন পেলে রুটির ভিতর এক চিঠি— বন্ধু, অনেকদিন তোমার সন্ধানে ঘুরেছি, শেষে জেলারের সঙ্গেও ভাব জমাতে হল, হায় রে কপাল? আজ সুদিন এসেছে অনেক চেষ্টায় পেয়েছি চাবি, দেখা হবে রাতদুপুরে।

দূরের রাখাল বালকের মিঠে স্বরে কান রইল ভরে— গোষ্ঠের ঘণ্টার সুর বুঝি গোধূলিতে খেয়া ভাসাল— মুহূর্তের জন্য সব সে ভুলে যায়, অস্তিত্ব লীন হয় অতল গভীরে, ঐ তো আকাশ ঘিরে ছায়া আসছে নেমে, এখনি আসবে, সে আসবে— তার পর কোন্ তন্দ্রাতুর লোকে যাব দোঁহে যেখানে প্রাণের উদ্দাম শক্তি অঙ্কুরিত হয় নি, নিয়তির বুকের ভিতর আছে লুকিয়ে বিকশিত হবার প্রত্যাশায়।

এমনি করে প্রহর এগিয়ে আসে, কে এসে দাঁড়ায় নিভৃতে, সে কি বকুলার ভুতুড়ে ছায়া। বকুলা, তুমি তো মূর্তিমতী মুক্তি, কেন এলে এই বিপদের মুখে, আমার ভাগ্য তুমি কি জানো না? গ্রহের অন্তরে অন্তরে চলেছে যে বিপুল আলোড়ন

তারি উৎক্ষিপ্ত উল্কা আমি ঘুরপাক খেতে খেতে চলেছি কোন্ অজানা কক্ষপথে, নিরেট অন্ধকারের ব্যাকুলতা জমাট বেঁধেছে আমার বুকের তলায়, নিশুতি রাত ডাক দিয়েছে আমাকে অন্ধকার কবরের নীচে।

চুপ, সময় নেই জেলের সীমানা থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে এখনি। দেখছ না, সমুদ্রমথিত রাত আসছে এগিয়ে অজগরের কুণ্ডলী যেন, চাঁদের স্তিমিত আলো তো বেশিক্ষণ থাকবে না। খোলা দরজায় বেরিয়ে পড়ল দুজনে, আলো-আঁধার চমক লাগায় পদে পদে, অন্ধকারের মধ্যে দুই দিশাহারা ছায়া নিঃশব্দে চলেছে।

সৃষ্টির মোহানা থেকে সব বস্তু গেছে মুছে, পিছনে গর্জে আসছে দিগন্তব্যাপী কালভ্রূকুটি জগৎকে বুঝি লেহন করে নিতে চায়। প্রলয়ের ভৈরব উঠেছে জেগে, ঝিলিকহানা বিদ্যুতের হুংকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল অস্ফুট আর্তনাদ, মৃত্যুর উদ্যত বজ্র বকুলার লুকানো রিভলভারে উঠল চমকে দুড়ুম দুড়ুম। পুলিস তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে তার আগেই। চকিতে চোখে পড়ে লুণ্ঠিত দুই দেহ— রূপহীন চেতনার অভিসার। মুহূর্তে ভেসে গেল কোন্ অজানার কূলে— শুধু শোনা যায় চারি দিক থেকে দমকা হাওয়ায় গাছপালা লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে, আর ফাঁকা বুকের হুতাশ যেন আকাশে বাতাসে উঠছে ফুঁপিয়ে।

২

লোভ

উপরতলায় আধেক খোলা পর্দাখানার ফাঁকে
একটুখানি গ্রীবার বাঁকানো রেখা,
একটুখানি ঠিকরে-পড়া আলো,
রামধনুকের ছবি-আঁকা বাঁকা নয়ন,
চোখের তারায় ঝাপসা ভাষা
মনের গোপন গোধূলিতে।

সামনে পথে ঐ কে যায় কাজের তাগিদ নিয়ে
ভাবনা যেন পিছনে তার ছায়ায় মেশা।
ফরসা আকাশ—
আঁট করে লালপেড়ে শাড়ির আঁচল বেঁধে কাঁখে
পাড়ার মেয়ে বাজার নিয়ে চলে।
মুদির ছেলের খামখেয়ালি দুষ্টুমিতে
সজাগ করে গলি।
ফিরে দেখি তীক্ষ্ণ লোভে দুয়ার পাশে
ঝুড়ির 'পরে তাকায় কালো বেড়াল
ঝকঝকে তার নজর ওঠে জ্বলি।
দূর আকাশে চিল উড়েছে কোন্ নিশানায়
মেয়েটি ঐ তাড়াতাড়ি ঢাকে ত্রস্ত হাতে
যত্নে-কেনা মাছের ঝুড়িটাকে।

পথ

বরন তাহার উজ্জ্বল শ্যাম
তন্বী মেয়ে
নরম হাওয়ার দোলন-খাওয়া
ঝুমকো লতা।
রাতজাগা তার ক্লান্ত গলার কালাংড়াতে
ঘনিয়ে তোলে শেষরজনীর আবেশখানি
ভোরের হাওয়ায় গলির আকাশটাতে।
উদাস মনে পথিক হঠাৎ ছাড়ল দীর্ঘশ্বাস,
থমকে দাঁড়ায় কী ভেবে যে,
একটু পরে চলল দ্রুত পায়।
দেখল চেয়ে ফিরিওয়ালা
সড়ক দিয়ে হাঁকে।
দেখল চেয়ে জীবনধারার জোয়ার-জলে
ছোটোখাটো কতই কী যে ভাসিয়ে আনে
শুধু একি গতির বেগে ক্ষণিক লীলা,
পথের দান কি মনের কোণে
রইবে কিছু বাকি।
তাই দিয়ে কি জ্বালবে শিখা
চিরগোপন প্রাণের আঁধারলোকে
অন্যমনা অবসরের কোণে
পড়বে কি তার ছায়া।

স্মৃতি

এই গৃহ এই পুষ্পবীথি
যারে ঘেরি একদিন তোমার কল্পনা
গড়েছিল ইমারত দীপ্ত গরিমার,
উত্তপ্ত কামনা তব যার প্রতি ধূলির কণায়
জীবন্ত করিয়াছিল তব মুহূর্তেরে।
যে বাসনা মনে ছিল পুরিল না,
অবসন্ন প্রাণ
গেল চলে ছায়া ফেলে অঙ্গনে প্রাঙ্গণে।
চেয়েছিলে একদিন তুমি
ভোগের শৃঙ্খলপাশে বাঁধিবারে যারে
আজো বুঝি ছড়াইছে তাহারি লালসা
কামনার রাঙা রঙ
দিনান্তের গোধূলিতে।
ধরণীর খেলাঘরে ঘুরে ফেরে
দেহহারা চেতনা তোমার।
পার্থিব বস্তুর স্তূপে নিষ্ফলের একান্ত সাধনা
শ্রান্ত হয় নাই আজো,
ব্যর্থতার আর্তবাহু আলিঙ্গিয়া আছে চারি ধার
প্রকৃতির দারুণ ইঙ্গিতে
ভেসে গেছে অলঙ্ঘ্যের পারে

জীবন-তরণী তব,
পিছনের হাহাকার, নৈরাশ্যের উন্মত্ত আঘাত
পারে নি ফিরাতে তারে।
তবু তারি রুদ্ধকণ্ঠ প্রতিবাদ
আঁধারে গুঞ্জিয়া ফেরে দীপ-নেবা মিলনরাত্রির।

এই ঘর, এই ফুলের কেয়ারি
একে ঘের দিয়ে তোমার খেয়াল
জাগিয়েছিল পরীস্থানের ইমারৎ।
তোমার তপ্ত কামনা
রাঙিয়েছিল তার প্রত্যেক ধূলিকণাকে,
তার প্রত্যেক মুহূর্তকে করেছিল তোমার আবেশ দিয়ে আবিষ্ট।
তুমি চলে গেলে,
অকৃতার্থ আকাঙ্ক্ষার ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে
অঙ্গনে প্রাঙ্গণে।
তোমার চাহনি যাকে চাইতে চেয়েছিল
এখনো তার জীবন থেকে ঠিকরে পড়ছে সেই লালসার রশ্মি
দিনের শেষ প্রহরের শেষ আলোয়।
অশরীর খেলাঘরে ঘুরে বেড়ায়
তোমার দেহহারা চেতনা;
নিখিলের চরম সাধনা
পার্থিব বস্তুর রূপে আজো হোলো না প্রত্যক্ষ।
আর্ত বায়ুর আলিঙ্গন তার চারদিকে।

কালের দারুণ ইঙ্গিতে
জীবনের পরপারে ভেসে গেছে তোমার তরণী,
বিচ্ছেদের হাহাকার, বিনাশের আলোড়ন
কিছুই পারল না তাকে থামাতে,—
তবু ~~[illegible]~~ সকরুণ অস্বীকার
কেবলি টান দিচ্ছে
মিলন রাত্রির কালো ~~[illegible]~~ পর্দাটাকে।

"স্মৃতি" কবিতার রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিচিত্র

পাহাড়ি মেয়ে

ঘনপাতা-ঢাকা নাসপাতিবীথি
জানলাতে ফেলে ছায়া।
সারাবেলা সেথা আলো-বাতাসের
ছেলেমানুষির খেলা।
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আকাশে ছড়ানো
ফেনিল অচল ঢেউ ;
তলায় তাহার স্বচ্ছ নীলিম আভা।
ফুরফুরে হাওয়া লেগে
সিরসির করে পাতা
শরৎকালের শুভ্র স্বপ্ন
আকাশে প্রলাপ মেলে।
ভুট্টাখেতের আড়ে দেখা যায়,
পাহাড়তলির মাঠে
ছোট্ট মেয়েটি ; ছুটে-চলা দেহে
চিকনিয়া ওঠে আলো।
খুরপির ফলা ঝলকে তাহার হাতে।
প্রজাপতি যেন
ডানা মেলে ভেসে চলে
রৌদ্ররঙিন প্রভাতে হালকা হাওয়ায়

চপল চকিত প্রাণ,
পায়ের তলায় ঘাসে ঘাসে তার
খুশি করে যায় দান।
দিলখোলা এই আশ্বিন আজি
রূপায়িত করে তারে
আলোর অলংকারে॥

বিরহ

স্তব্ধ রাতের তরঙ্গহীন স্রোতে
অলকার লিপি এল কার কাছ হতে,
উত্তরে তারি বিবাগী বিরহী হিয়া
স্বপনে ভাসাল অজানা কূলের খেয়া।
ভাষা-ডুবে-যাওয়া অন্ধকারের বাণী
ইশারা ভ্রূকুটি পাইন-শিখরে হানে,
বক্ষ কাঁপায় অদেখা চরণপাতে
মৌন ব্যথার ভারমন্থর রাতে।
শ্রাবণবাসরে অশ্রুবাদলধারা
দূর আঁচলের পরশ-কাঁপনে সারা।
ব্যাকুল চাওয়ার বিরামবিহীন আশা
শূন্যে পাঠায় নিরুদ্দেশের ভাষা,
মরু-সাগরের কালো মরীচিকাতীরে
জোনাকি-আলোয় পথ খুঁজিয়া সে ফিরে॥

নিশি-পাওয়া

জানালার বাইরে
খামখেয়ালি আলো,
ভিতরের বস্তু,
কিছু চোখে পড়ে
কিছু পড়ে না।
কাঁপে দীপশিখা
কাঁপে লম্বা ছায়া
ঘরের কোণে
কাঁসার বাসনে
ঠিকরে পড়ে
সোনালি ঝকমকানি।
দোলনায় শিশুর মুখে
দেয়ালার খেলা যেন
মরীচিকার ছলা।
নিশ্চিন্ত কুকুর ঘুমোয়
নিশ্বাসের ওঠা-পড়ার ধাপে
যা পেয়েছে যা পায় নি
তার ক্ষীণ সাড়া
ঢেউ লাগছে আর-এক প্রাণের ধারায়
সরসরিয়ে কী গেল
চলতি প্রাণের আলো

নিশি-পাওয়া

টিকটিকির গলা
শিকারী নারীর থম্‌থমে চলা
আলনায় সাজানো
আটপৌরে শাড়ি
দেহের ছাপ
এখনো আছে ঘিরে।
ওষুধের খোলা শিশি
ঝক্‌মকে ডাক্তারি যন্ত্র
বিজ্ঞানের আয়োজনে
অন্ধকার মুচকে হাসছে।
মধুমালতীর গন্ধে
বারণ্ডার বাতাস ঘন
স্মৃতির মিঠে নেশা
রসনার স্বাদে রসিয়ে তুলেছে
গন্ধে গাঁজাল তৃষা।
নীল বুটিদার উড়নি
গায়ে ঢাকা।
বড়ো বড়ো চোখ দুটো
ফাঁকা মনের জানলা
তার শূন্য গর্তের ভাষায়
গা কেমন করে।

হরিবোল হরিবোল
বাহির ফটকে।

নিয়ে যায় কার দেহ
ঘর খালি ক'রে।
লকলক জ্বলে চিতা
মিটিয়ে সে নেয়
লেহন করার আগ্রহ।

নিশি-পাওয়া প্রহর
ঘুমে-চলা কাকে
নিয়ে চলেছে গুহার দিকে
চলেছে সকল কাজ
যার প্রাণের গতি
গেছে থেমে
তার ভাবের সত্তা
শূন্য ঘরের পর্দার আড়ালে
চাপা নিশ্বাস ফেলছে।

অন্ধকারে

নুয়ে-পড়া নিমের বাঁকা ডাল
হেলে আছে আলগা খোঁপার 'পরে।
অন্ধকারে কাঁদন-চাপা বুক
আঁকড়ে আছে পাথরখানা যেন।
ফোঁটা ফোঁটা ঘামে কপাল ভিজে,
দূরে-চাওয়া কালো চোখের পাতা
ধেয়ান পাঠায় ভূ-সীমানার পারে।
মাথার উপর
তারায় তারায় আকাশ করে থরোথরো,
তাকিয়ে থাকে সাথীবিহীন বোবার ব্যথা।
হেনা-বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে জোনাক জ্বলে,
প্রেতচ্ছায়ার অতৃপ্ত চোখ আগুন হানে।
বাদুড়ের ডানার ঘায়ে, নিশুত রাত্রি
বক্ষ চেপে হাঁপিয়ে ওঠে।
হঠাৎ গোরুর গাড়িখানা হাটের পথে
প্রাত্যহিকের গ্রাম্যভাষা বয়ে আনে।
লণ্ঠনের ঝিকিমিকি দোল-খাওয়া আলো
ঝিমন্ত চাকার সুর দিয়ে যায় কানে
দূর গ্রামের ইঙ্গিতে।

দীনবন্ধুর অবসান

তোমাকে দেখেছিলুম প্রলয়মুহূর্তে,
অজ্ঞানের অন্ধকারের আবিলতায়,
তোমার মুখের উপর থেকে
আত্মপ্রকাশের আবরণ সরে গিয়েছিল,
মূর্ছাভারাক্রান্ত গোধূলির ধূসরতা
ঘনিয়ে এসেছিল দেহে মনে ;
আচ্ছন্ন চেতনার আলোড়ন
দেহের অণুপরমাণুকে করছিল অস্থির,
তাদের আকর্ষণের জাল ছিন্ন হতে দেরি নেই ;
সামনের আকাশে তারায় লেপা আলপনা ;
ঝাপসা চোখে ঠিকরে পড়ছে
দিনান্তের শেষ আভাসের আভা।
দেহমুক্ত অনুভূতি বেরিয়ে এল
অন্তিম আসক্তির আবেষ্টন থেকে,
চৈতন্যনীহারিকা বিলুপ্ত হয়ে গেল অতল তমিস্রায়।
বন্ধনহীন সত্তা তার মিড়ের কাঁপন দিতে লাগল
চৈত্রসন্ধ্যার আকাশে।
মন্থর প্রাণের অবসন্ন মাধুরী
শেষ সকরুণ টান দিয়ে গেল মনের পর্দায়।

নীলকণ্ঠ

বিশ্বসমুদ্র মন্থন ক'রে
নাগেন্দ্রের উত্তপ্ত নিশ্বাস উঠছে
প্রাণের সরল গতি তারি চাপে উৎক্ষিপ্ত
পৃথিবীর পঞ্চভূত নির্মম মূর্তি নিয়েছে,
বিজ্ঞানীর হাতে নিষ্ঠুর রূপ তার
বেরিয়ে পড়েছে,
মনুষ্যত্বকে দলিত ক'রে
বর্বরের অট্টহাসিতে কাঁপছে ধরণী :
কল্কি-অবতারের চোখে ধ্বংসের স্বপ্ন
খসে-পড়া উল্কা বুঝি,
ঠিকরোনো চোখের আগুন তার ?
তর্জনী স্থির ইঙ্গিতে বাঁধা চাপা ওষ্ঠে
নির্দেশ করছে নিদারুণ সমাপ্তি।
ভবিষ্যৎ ভ্রূকুটিকুটিল অবিচলিত
প্রতীক্ষা করে আছে দারুণ অন্তিমকে।
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ডেকেছে প্রলয়ের বান
দিক-বিদিকে মৃত্যুর করতালি
স্থায়িত্বকে উপহাস করে।
বৃহৎ আকাশ-আবেষ্টনে
কোনো দাগ অবসাদ গ্লানি নেই।

অসীম মণ্ডলে রয়েছে প্রাণবায়ু
বিরাট বুকে ঘুমিয়ে
প্রলয়ের মত্ততা নিয়ত প্রতিহত হচ্ছে
সেই স্তব্ধতায়
সৃষ্টির বেগমত্ত গতি যুগে যুগে
ধুয়ে মুছে নিচ্ছে যত জঞ্জাল,
যেমন বাসুকি কণ্ঠের গরল
শোষণ করে নিয়েছিল
একই গণ্ডুষে।

সঙ্গ

বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা খুঁজে ফেরে সঙ্গরস।
উষার উন্মুক্ত নেত্রে
অবগুণ্ঠিত আঁধারের তলায় তলায়
চলেছে তার খোঁজ।
নীহারিকার বাষ্প-আবেষ্টনে
আলোর গতি ছুটে চলে,
তারই তরঙ্গ তোলে
নয়ন ভরে রঙের আভা।
উড়ন্ত প্রজাপতি তৃণে তৃণে ছায়া ফেলে
নিঃসাড়ে চলেছে ফুলের সন্ধানে—
সঙ্গ-কাঙাল প্রাণ অবাক হয়ে ভাবে,
তার চাওয়ার কি কোনো রূপ আছে।
না সে কেবল চিন্ময় পাত্র থেকে উপচে-পড়া অনুভূতির
নীরব পদক্ষেপ!
অথচ এই কায়াহীন মোহ কী নিবিড়
জীবনের প্রতি কোণ ঘিরে—
শত সম্বন্ধের গ্রন্থি-ডোরে বাঁধা মাটির টান
সৃষ্টির মহিমা প্রতিক্ষণে
রূপের আধার ভেঙে ভেঙে গড়ছে,
বিচিত্র আবেদনভরা নিখিলের প্রাণ।

স্তব্ধ চন্দ্র বাড়ে
বাজে ঐ ঝিল্লির মঞ্জীর,
পাল-তোলা নিভৃত রজনী
পাড়ি দেয় আষাঢ়ের মেঘের ছায়ায়—
কাজরীর সুরের করুণা পথের সঙ্গিনী তার।
সঙ্গের বন্ধনস্পৃহা
নীরব বিস্ময়ে চেয়ে থাকে,
চেতনার নগ্ন কান্তি শূন্যতা প্লাবিয়া
বিছায় যেখানে আঁচলের ধানীরঙা মায়া
শুষ্কতার দীর্ণ বুক জুড়ে।

সাঁওতালী

ঐ দেখা যায় হনহনিয়ে
ভুবনডাঙার মাঠে
পারুলডাঙার মেয়ে চলে
রবিবারের হাটে।
রোদ্দুরে মুখ ঝকঝকানো,
সিঁথি চুলের ভাঁজে,
রক্তজবা উঁকি মারে
এলোখোঁপার মাঝে।
কালো অঙ্গ জড়িয়ে ধরে
তরুণ আলোর ফাঁদে,
নিকষশিলার মূর্তি যেন
সোনার তারে বাঁধে।
সবুজ পাতার ঘন ছায়া
গায়েতে ওর লিখা।
চোখের কোণে চিকিয়ে ওঠে
পলাশফুলের শিখা।
শ্যামল ধরার মাটির সঙ্গে
প্রাণ নহে ওর ভিন্ন।
অঙ্গেতে ওর ভঙ্গিতে ওর
অরণ্য দেয় চিহ্ন।

চিত্রলেখা

ঘুম-সাগরে কাঁপন লাগে
ঝিল্লির যেই ডাকে,
নিশীথমাঝে আলো ছড়ায়
যে জোনাকির ঝাঁকে,
প্রজাপতির হাল্কা ডানায়
উদ্‌ভ্রান্ত যে গতি
আধা চেতন-অচেতনের
এ সেই মূর্তিমতী।

গুরুদেবের প্রতি

যিনি ছিলেন দুজনের মাঝে
ইন্দ্রধনুর সেতু
যাঁর রঙের তুলি বুলিয়েছিলেন চোখে
সেই আলোতে দেখেছি বিশ্বের রূপ।
আজ সেতু ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন
মাঝের ফাঁকা আকাশ পূর্ণ হ'ল
অনুভূতির স্তব্ধতায়।
যে মিড়ে বেঁধেছিল প্রকৃতি
কবিচিত্তের তার,
সেই জ্ঞানের প্রাচুর্য ধ্যানের ইন্দ্রজাল,
দিনের গোধূলিতে মিশে গেল,
তিনি নিবে গেছেন দৃষ্টির সীমানায়,
নির্বাপিত জ্যোতি তাঁর উদ্দীপ্ত হ'ল
নিখিলের আকাশপ্রদীপে।
অন্তিম দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে গেল
বাহিরের জনসমুদ্রের বুকের ভিতর,
মানবহৃদয়ের রহস্যগুহায় বাণী হ'ল
তাঁর বন্দী—
যে শ্রাবণ-পূর্ণিমা কতবার তাঁর
প্রাণকে উদ্‌বেলিত করেছে—

সেই পূর্ণিমাতিথিতে ভাসল
পরপারের খেয়া—
বিদায়ের সারিগানে।
উচ্ছলিত বর্ষার দিন
ছিন্ন মেঘের পালে পালে
ভূমার অনুরাগদীপ্ত
অস্তাচলের ম্লানায়মান আবেগের আভা রইল থমকে
স্নেহের অজস্রতায় সমাপ্তির শেষকথা
চিত্তে দিয়ে গেলেন ভরে,
সেই নীরবকণ্ঠের বাণীর ইঙ্গিত
পূর্ণ করে থাক্ আমাদের
নিত্য নিবেদনের থালা।

সৃষ্টিরহস্য

১

আঁধারের তলায় তলায়
লহরীর লীলা
সৌরচক্র-রচনায় মত্ত অহরহ।
সেই গতির ছন্দে আমরাও চলি
পালার পর পালা গেঁথে।

২

দিন কখন শুরু হ'ল জানি না
কালের ডানার তলায় ঘুমন্ত ছিলুম দুজনে,
যুগান্তের তীর হতে তীরে তোমার সঙ্গে
এমনি করেই বারংবার দেখা
কখনো প্রদোষের মরীচিকা
সকরুণ আভা ফেলে চোখে
কখনো বা অসমাপ্ত নীহারিকার বেগে
আমাদের চিত্ত উৎক্ষিপ্ত।
অস্তিত্বের অন্তহীন চাওয়া সায়াহ্ন-আকাশে
নিমেষহীন নিস্তব্ধ
গ্রহে গ্রহে বিহ্বলতা থমকে তাকায়।

৩

শুধু রোমাঞ্চন—
লোক হতে লোকান্তরে অলক্ষ্যে পাঠায়
চুম্বকের নিত্য আকর্ষণ।
প্রাণের সে একান্ত আবেদন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে শিহরায়
সান্নিধ্যের নিবিড়তা—
যৌবনের মোহমুগ্ধ দিন—
মৃন্ময়ীর পাত্র পূর্ণ করে
ঢেলে দেয়
সৃষ্টির রহস্যসুরা।

সাইরেন

নির্মোক খসে পড়ে গেল,
সেই ভালো—
দেখা দিল নগ্ন রূপ,
চিনে নেব কতদূর কামনার
নীচের সীমায়,
যেতে পারো নেমে,
গরীয়সী পাশ্চাত্য সভ্যতা—
আজিকার ব্যর্থতায়
ভূলুণ্ঠিত উচ্চ মাথা
গৌরবের ইতিহাস তব
লজ্জা-লাল।
লুব্ধ ক্ষুব্ধ বাসনার তাণ্ডব চাৎকার
মর্ত্যের হৃদয়জোড়া
স্বার্থঘন ছায়া
ধ্বংসের বিকট মূর্তি ধরি
জীবনেরে করিতেছে গ্রাস।
এতকাল যারে ভুলায়ে রাখিয়াছিল
বড়ো কথা বড়ো নাম দিয়ে
মানুষের সেই আদিমতা
ভস্ম-চাপা আগুনের

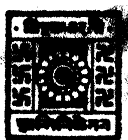
ইন্ধন-ক্ষমতা
অলক্ষ্যে বীর্যেরে করে ক্ষয়।
নিষ্ঠুরের আবির্ভাব
ধূমকেতু
বিমানে বিমানে—
উদ্গারিছে অকস্মাৎ
উল্কানল-শিখা,
মৃত্যুর চরম অস্ত্র
করিয়া প্রয়োগ
গর্বিত মানুষ চায়
করিতে খর্বিত
বিশ্বের রহস্যলোক।
ভাগ্যের সে উপহাসে পরিব্যাপ্ত
নিখিল আকাশ
সেথা কিছু ক্ষয় ক্ষতি নাই—
যুগ হতে শুধু যুগান্তের তীরে
জন্মব্যথা আঁধারের
গর্ভকারা ভাঙি
অনন্তে গুমরি ফেরে
প্রলয়রাত্রির পরপার
নবজাতকের বার্তা ঘোষিত করিল আজ
মৃত্যুর সাইরেন।

কোনারক

কালের রথ চলে গেছে
সেই চাকার দাগ তোমার গায়ে আঁকা।
প্রাচীন সংস্কৃতির পতাকা তুলে
বালুতীরে তুমি এখনো দাঁড়িয়ে —
অস্তরবির কিংশুক-অঞ্জলি
তোমার চূড়ায় নিয়ত রাখে
বিদায়বেলার শেষ নিবেদন।
কত মানুষের আশাকে
আঁকড়ে রেখেছে,
কত শিল্পীর চিত্তছায়া
ঘুমিয়ে আছে তোমার বুকে।
অকথিত বাণী যাদের
তোমার গায়ে মূর্তি নিয়েছে,
সেই-সব পরমায়ু অসীমে বিলীন।
সময়কে ফাঁকি দিয়ে
তাদের প্রাণের উৎস রইল লুকিয়ে পাথরে
পৃথিবী অবাক হয়ে আজো দেখছে
সেই অপূর্ব প্লাবন।

ভাবলোকে শরৎ বর্ষা এখনো ফুরোয় নি,
অনুভূতির নিত্যলোকের জীবন্ত ছবিতে
ধরে নি মরচে কিছুমাত্র।
আকাশভরা কালো মেঘের
ফেনিল ছায়া—
সেদিন জাগাত নায়িকার
বুকজোড়া উদ্‌ভ্রান্তি।
ঝরা বকুলের মালা মারত উঁকি
বেণীর কোলে,
মহুয়াবনে বসন্তে লাগাত
শিষের হিল্লোল,
পলাশে চমকাত পূর্বরাগশিখা।
রজনীর স্বপ্ন-আবিলতায়
কল্পনার উত্তপ্ত ছবি এঁকেছিল
যে-সব রূপকার—
তাদের দিনপঞ্জিকার
প্রেম প্রীতিগুলি আজো
মনে হয় চিনি চিনি।
জন্মান্তরের বন্ধ কপাট খোলে না।
চিরপরিচিত স্মৃতি বহন করে,
চেতনার অন্তরালে গোপন আছে তবু,
একই অস্তিত্বের সাড়া।
জগৎজোড়া প্রাণের লীলা,
মনোলোক দেহলোক ঘিরে

করছে নিত্য রচনা।
উর্বশীর অমৃতপাত্র দেশ কাল
ব্যাপ্ত করে উপছে পড়েছে—
যুগান্তর ধরে চলছে তার
বারংবার
রূপান্তরিত পরিবেশ।



মূল্য ১৩·০০ টাকা